গ্রন্থ পর্যালোচনা

সুবিশাল কাপ্তাই লেক: শুধুই কি আনন্দ ভ্রমণের জায়গা?

অপরাজিতা মিত্র

কাপ্তাই বাঁধ! যদিও পৃথিবীব্যাপী এটি কাপ্তাই লেক বা হ্রদ নামে খ্যাত, কিন্তু লেকের নীল জল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের, বিশেষ করে চাকমাদের কাছে এখনও 'চাকমাদের কান্না' বলে পরিচিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি জেলা রাঙামাটি, যা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে রাঙামাটি জেলার একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান কাপ্তাই লেক। এখানে মানুষ অবসরের দিনে আনন্দ ভ্রমণে যায়। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই কাপ্তাই হ্রদের ইতিহাস প্রায় অজানা বললেই চলে। কাপ্তাই লেকের উৎস আর এর সাথে মিশে থাকা অসংখ্য মানুষের দুঃখকষ্টের ইতিহাস তুলে ধরেছেন সমারী চাকমা তাঁর *কাপ্তাই বাঁধ: বর-পরং* বইয়ে।

কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে প্রথম পরিকল্পনা শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনকালে, ১৯০৬ সালে। পরে ১৯৫৭ সালে ইউটা ইন্টারন্যাশনাল ইনক নামক নির্মাণ সংস্থার অধীনে বাঁধের কাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯৬২ সালে। ৬৭০ মিটার দীর্ঘ এবং ৪৫.৭ মিটার প্রশস্ত এই বাঁধের কারণে প্রায় ৫৪ হাজার একর জমি পানিতে তলিয়ে যায়, ভিটেছাড়া হয় প্রায় ১৮ হাজার পরিবার। তাদের প্রায় ৭০ শতাংশ ছিল চাকমা জাতিসত্তার। বাঁধের পানিতে ভিটেমাটি ডুবে যাওয়ায় অনেক মানুষ ভারতে যেতে বাধ্য হয়। প্রথমে দেমাগ্রী, তারপর নেফা (বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ)। এই যাত্রা পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে 'বর-পরং' নামে পরিচিত। এই কাপ্তাই বাঁধ পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের চিত্র, বর-পরং যাত্রার ইতিহাস এবং ভিটেছাড়া মানুষের দুর্ভোগের কথা প্রকাশ পেয়েছে এই বইয়ে। একই সাথে বর্ণিত হয়েছে জমিদার থেকে শরণার্থীতে পরিণত হওয়ার ইতিহাস। বর-পরং যাত্রার ইতিহাস নিয়ে লেখা এটিই প্রথম বই। একই সাথে প্রথম গবেষণাকাজও বলা যায়। অনেকের সাথে, যাঁদের অধিকাংশের বয়স সত্তরের ঊর্ধ্বে, কথোপকথন ও সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে এই কাজ। যাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাঁদের সকলেই কাপ্তাই বাঁধের কারণে ভিটেছাড়া হয়েছেন। কেউ বর্তমানে আছেন খাগড়াছড়িতে, কেউ বা রাঙামাটির অন্য কোন জায়গায়। আবার কেউ নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে নাম লিখিয়েছেন শরণার্থীর খাতায়, পাড়ি জমিয়েছেন ভারতে। প্রথমে মিজোরামের দেমাগ্রী, তারপর নেফায়; অনেকে নেফায় না গিয়ে চলে যান ত্রিপুরায়।

এই সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে জানা গেছে এমন অনেক গ্রামের নাম, যা তলিয়ে গেছে কাপ্তাই লেকের পানিতে। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর কর্ণফুলী নদীর পানি বেড়ে গেলে তাতে মাইলখানেক দূরে কাজালংয়ের পানিও বেড়ে যায়। এতে তলিয়ে যায় সব গ্রাম, আর এখন তা সুবিশাল কাপ্তাই লেক। এই লেকের পানিতে ডুবে আছে 'পুরনো সেই গ্রাম উগলছড়ি'। "সেই থেকে ডুবুরির মতন জীবন আমাদের। বাঁধের পানিতে ভেসে গেছি আমরা, ডুবসাঁতার দিয়ে একেকজন উঠেছি একেক দেশে। এই কাপ্তাই লেক হাজারো মানুষের কান্নার চোখের জল।"

এক সাক্ষাতে কাপ্তাই বাঁধকে 'মৃত্যুফাঁদ' বলে চিহ্নিত করেছেন রাঙামাটির বাঘাইছড়ি এলাকার অধিবাসী করুণাময় চাকমা, যাঁদের আদি নিবাস ছিল রাঙামাটির ঝগড়াবিল মৌজায়। আর এই ঝগড়াবিল মৌজা বর্তমানে কাপ্তাই হ্রদের পানির নিচে। ভিটেছাড়া হয়ে তাঁরা প্রথম বসতি স্থাপন করেন মারিশ্যার রূপকারীতে নির্ধারিত কাজলং রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায়, যেখানে সূর্যের আলো কখনই মাটিতে পড়ে না। সূর্যের আলো জঙ্গলের ওপরেই থাকে আর ম্যালেরিয়া, কলেরাসহ অনেক রোগে ভুগে মারা গেছে অসংখ্য মানুষ। শুরু হয় বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই। কারও ভাষায়, "চাকমারা পৃথিবীর যেখানে যত দূরেই থাকুক কাপ্তাই বাঁধ আর বাঁধের পানি জীবনের সাথে বইতেই থাকবে। এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে এখানে।"

বর-পরং যাত্রা ছিল ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনের মত। এই যাত্রাকে তিন পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্ব ছিল রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, মারিশ্যা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভারতের মিজোরামের দেমাগ্রীর দিকে যাত্রা। এই যাত্রায় প্রথমে একটি গ্রামের বাসিন্দা কিছুদূর যাওয়ার পর বাজি ফুটিয়ে সংকেত দিলে আরেক গ্রামের মানুষকে চলে যাওয়ার জন্য গ্রাম ছাড়তে হত। দেমাগ্রীতে ভারত সরকার চাকমাদের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করে। এ কারণে অনেকে ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একসময় পাকিস্তান সরকার চাকমাদের সাথে আলোচনার জন্য দুজনকে পাঠায়, যাতে তারা ভারতে চলে না যায়। কিন্তু অনেকেই চলে যায় ভারতের দেমাগ্রীতে আর নাম লেখায় শরণার্থীর খাতায়। দেমাগ্রী যখন লোকারণ্য, তখন ভারত সরকার তাদের নেফা অর্থাৎ বর্তমান অরুণাচল প্রদেশে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তা ছিল আরেক কঠিন জীবন। সে যাত্রার কথাও এই বইয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। নেফার সেই কঠিন দিনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে : অনেক ঠান্ডা, খালি পানি আর পানি। বর্ষাকালে এক বৃষ্টিতে সব ভাসিয়ে নিয়ে যেত। জঙ্গল আর খরস্রোতা নদী, বৃষ্টি হলেই ভয়ানক হয়ে ওঠে সেই নদী।

কাপ্তাই বাঁধ পূর্বে ১৯৫৩ সালে নির্মাণ করার কথা ছিল শুভলংয়ের চিলকধাক নামের এক জায়গায়, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা সরিয়ে আনা হয় বর্তমান স্থানে। আর এই কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হয় গাছ কাটা; উজাড় হয় বনাঞ্চল। এর কারণ ছিল, যাতে পানি আসার পর নৌকা চলতে কোন অসুবিধা না হয়। ১৯৬৩ সালে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ নির্মাণ শেষ হলে পানি বাড়তে শুরু করে, তলিয়ে যায় চাষযোগ্য সব সমতল ভূমি, তারপর টিলাসহ বহু মানুষের ঘরবাড়ি, এমনকি চাকমা রাজার বাড়ি ও বৌদ্ধ মন্দির। রক্ষা পায়নি প্রকৃতি আর পশুপাখিও। বাঁধ নির্মাণের পূর্বে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার চাকমাদের প্রতিশ্রুতি দেয় যে বাঁধের মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে তা দিয়ে তাদের ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে এমন কিছুই হয়নি। কাপ্তাই বাঁধের কারণে যারা ঘরবাড়ি হারিয়েছে, তারা কখনই আলোর সন্ধান পায়নি।

এই কাপ্তাই বাঁধের সাথে জড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষের দুঃখ আর কান্না। এই দুঃখ আর কঠিন জীবনের কথা সমারী চাকমা তাঁর *কাপ্তাই বাঁধ: বর-পরং* বইয়ে বর্ণনা করেছেন। কাপ্তাই বাঁধের প্রভাব, এর কারণে সৃষ্ট সর্বোচ্চ প্রায় ১০০ ফুট গভীর কাপ্তাই হ্রদ এবং হ্রদের পানিতে মিশে থাকা হাজারো মানুষের চোখের জল– সব কিছুর একটা লিখিত প্রমাণ হিসেবে ধরে নেয়া যায় এ বইকে। আর একই সাথে বলা যায়, এক অজানা ইতিহাসের উন্মোচক। (*কাপ্তাই বাঁধ: বর-পরং* ডুবুরিদের আত্মকথন: সমারী চাকমা॥ কমরেড রূপক চাকমা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট॥ প্রচ্ছদ: জয়তু চাকমা॥ পৃষ্ঠা: ১১২॥ মূল্য: ২৫০ টাকা)